ভারতপথিক ফাদার আঁতোয়ান

জাহিরুল হাসান

আমরা যারা সাধারণ সংসারী মানুষ, আমাদের বহু সীমাবদ্ধতা। নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্র চিন্তার বেড়াজালে আমরা বাঁধা থাকি। বিভূতিভূষণের ভাষায় 'বদ্ধজীব'। কিন্তু কিছু কিছু মানুষ এমন আছেন যাঁরা রিপুমুক্ত হয়তো নন, তবে রিপুর দাসত্ব থেকে মুক্ত একথা বলা যায়। এঁরা নিজেকে মুছে ফেলে সমাজ, পরিবেশের সঙ্গে মিশে যান। এমনই একজন নমস্য ব্যক্তি ফাদার আঁতোয়ান।

বেলজিয়ামের নাগরিক যিশুসংঘের সদস্য রেভারেন্ড ফাদার রবের আঁতোয়ান মানবসেবার ব্রত নিয়ে ভারতে আসেন ১৯৩৯ সালে। পঁচিশ বছরের যুবক তখন তিনি। দীর্ঘ চর্চা ও অধ্যবসায় স্থানীয় ভাষা এবং সংস্কৃতিতে পাণ্ডিত্য অর্জন করলেন। ঠিক করলেন এদেশেই কাটিয়ে দেবেন সারা জীবন। স্বদেশ স্বজন ছেড়ে ভারতের নাগরিকত্ব নিলেন ১৯৫০ সালে। নিজেকে তিনি বলতেন 'দ্বিজ'। কারণ ভারতে হল তাঁর দ্বিতীয় জন্ম।

সেন্ট জেভিয়ার্স ইস্কুলে তিনি সংস্কৃত পড়াতেন। ছাত্রদের কাছে সংস্কৃত ছিল ভয়ংকর এক বিষয়। যেন তেতো বিষ। ফাদার বলতেন, 'বিষ' ওলটালেই তো 'শিব'। ছাত্রদের বোঝাতেন, ' 'ত্বং হি মাতঃ (মাতর্)' আর লাতিন 'তু মিহি মাতের'— বল তো তফাৎ কোথায়?' দেশপ্রিয় পার্কে গীতাজয়ন্তী মহাসভায় অনর্গল সংস্কৃতে গীতার ভাষা ব্যাখ্যা করেছিলেন। এমনকি সংস্কৃতে পত্রালাপও করতেন। তাঁর লেখা সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক দু-খণ্ডের A Sanskrit Manual and Book of Exercises বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পড়ানো হয়।

ফাদার ছিলেন প্রথাবিরোধী মানুষ এবং ক্ষেত্র বিশেষে প্রতিবাদী ভূমিকাও নিয়েছেন। ইস্কুলের রেক্টরের সঙ্গে তাঁর বনিবনা ছিল না। মুখের ওপর তাঁকে বলে দিলেন, 'জানেন ফাদার, আমার আপনাকে মনে হয় উৎসাহ আর চতুরালির সমন্বয়।' সহকর্মী ফাদার টি. ল্যুইসের স্মৃতিচারণায় উল্লেখ আছে এই ঘটনার।

অন্যান্য ফাদারের সঙ্গে ইস্কুলের আবাসনে না থেকে তিনি এবং ফাদার ফাঁলো দক্ষিণ কলকাতায় বাসা নিলেন। কিছুদিন এক বাঙালি পরিবারের সঙ্গে কাটিয়ে পাকাপাকি ভাবে বাস শুরু করলেন কালীঘাট পার্কের পেছন দিকে প্রিন্স গোলাম মোহম্মদ রোডস্থ শান্তিভবনে। যিশুসংঘ বাড়িটি কিনে নেয়। সেযুগে ক্যাথলিক চার্চের নিয়মকানুন ছিল খুব কড়া। জেজুইট

ফাদারদের সামনে ছিল মাত্র দুটি পথ খোলা— হয় চার্চ-পরিচালিত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে হবে, নয়তো পাদ্রি হয়ে জীবন কাটাতে হবে প্যারিশ্-এ। তখন একজন ফাদারের পক্ষে ধর্মীয় পোষাক ছেড়ে সাধারণ মানুষের মতো ঘোরাফেরা করা ছিল অকল্পনীয়। ফাদার আঁতোয়ান শুধু যে পৃথক বসবাস শুরু করলেন তাই নয় পোষাক-আসাকেও তিনি হতে চাইলেন খাঁটি বাঙালি। পুরোহিতের আলখাল্লা ছেড়ে পাঞ্জাবি-পাজামা-চপ্পল ধরলেন, কাঁধে চাপালেন ঝোলা এবং সেই বেশে কাটিয়ে দিলেন সারা জীবন।

শান্তিভবনের সেই বাসা ছিল প্রাচীন গুরুকুলের মতো। ফাদারের সঙ্গে থাকতেন দশ-বারোজন বাঙালি ছাত্র। সেখানে সাহেবিয়ানার লেশমাত্র ছিল না। থাকা-খাওয়া পুরোপুরি বাঙালি ঢঙে। বছর দুয়েক একসঙ্গে থাকার পর ফাদার ফালোঁ চলে গেলেন উত্তর কলকাতায় যেখানে তিনি গড়ে তুললেন শান্তিভবনের মতোই আরেক প্রতিষ্ঠান 'শান্তিসদন'। ফাদার আঁতোয়ান রইলেন শান্তিভবনের দায়িত্বে আমৃত্যু। সেখানকার আবাসিকরা তাঁর নাম দিয়েছিল 'মাঝি'। তিনি হেসে বলতেন, 'আমি এই তরণীর মাঝি।' ছেলেদের লেখাপড়া, খাওয়া-দাওয়া, সেবা-শুশ্রূষা, খুঁটিনাটি সব ব্যাপারেই তিনি নজর রাখতেন খাঁটি সংসারী মানুষের মতো। বিভিন্ন সময়ের আবাসিকরা তাঁদের স্মৃতিচারণায় এসব কথা লিখেছেন।

শান্তিভবনে যাতায়াত করতেন বহু গুণী মানুষ। ফরাসি ভাষা শিখতে আসতেন বুদ্ধদেব বসু, ওঁর বোদলেয়র অনুবাদের পেছনে আঁতোয়ানেরও কিছু অবদান আছে। ১৯৫৬ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে খোলা হলো তুলনামূলক সাহিত্যের বিভাগ। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ভারতে তুলনামূলক সাহিত্যের চর্চা এই প্রথম। বুদ্ধদেব বসু ছিলেন তাঁর দায়িত্বে। সঙ্গে টেনে নিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং ফাদার আঁতোয়ানকে। তুলনামূলক ভাবে প্রাচীন ইয়োরোপীয় এবং ভারতীয় সাহিত্য পড়ানোর ভার ছিল ফাদারের ওপর। এছাড়া তিনি সেখানে লাতিন ভাষাও শেখাতেন। বুদ্ধদেব বসু অবসর নেবার পর ১৯৬৭ সালে পুরো সময়ের জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন ফাদার আঁতোয়ান।

খ্রিস্টান যাজক সম্প্রদায়ে ফাদার আঁতোয়ান এবং ফাদার ফালোঁ ছিলেন তখনকার দিনে ব্যতিক্রম। শুধু চার্চের আবাসে না থাকাই নয়, দুজনের কেউ গির্জার দায়িত্বভার নেননি। একজন পড়াতেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যলয়ে আর একজন যাদবপুরে। কিন্তু পুরোহিতের দায়িত্ব একেবারে ত্যাগ করেননি ফাদার আঁতোয়ান। মাদার টেরেসার 'নির্মল হৃদয়ে' যেতেন সপ্তাহে একদিন মুমূর্ষু দুঃস্থদের জন্য উপাসনার পৌরহিত্য করতে। দক্ষিণ কলকাতায় অবস্থিত একটি ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সেবা করতেন পুরোহিত হিসাবে। সকালে প্রতিদিন যেতেন কারমেল নানদের কনভেন্টে দৈনিক উপাসনা পরিচালনার জন্য। আরও অনেক খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি।

কিন্তু শিক্ষকতাই ছিল তাঁর প্রিয় কাজ। তাঁকে যখন কিছুদিনের জন্য শিক্ষকতা থেকে সরিয়ে এনে প্রভিন্সিয়ালের দায়িত্ব দেওয়া হল, ছাত্রদের মধ্যে ফিরে যাওয়ার জন্য তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। সহকর্মী অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তকে জানালেন তাঁর দুঃখের কথা। আরেক

সংগীত শেখানোয়ও ছিল তাঁর সমান আগ্রহ। বহু ছাত্রকে গান শিখিয়েছেন তিনি। কয়েক বছর শরৎ বসু একাডেমির সংগীত শাখার সম্পাদকও ছিলেন।

বন্ধু এবং সহযোগী ফাদার ফালোঁ ফাদার আঁতোয়ান সম্পর্কে বলেছেন, 'তাঁর নিত্য-জিজ্ঞাসু মনের কৌতূহল ও জ্ঞানতৃষ্ণা তাঁকে কোনো বিদ্যাবিশেষের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে দিত না। আজীবন তিনি সমান আগ্রহে নব নব বিদ্যা ও জ্ঞানের অনুসন্ধানী ছিলেন। তা সত্ত্বেও পল্লবগ্রাহী ছিলেন না কোনো মতে। মেধাবী ছিলেন, তা ছাড়া অক্লান্ত পরিশ্রমী, কোনো বিষয়েই ভাসা ভাসা জ্ঞানে সন্তুষ্ট হতেন না। অধ্যাপক হওয়ার পরেও অধ্যাপনার চেয়ে অধ্যয়নই অনেক বেশি শ্রম ও সময় খরচ করে যেতেন।' তিনি পুরো সময়ের জন্য যোগ দেবার পরে বিভাগীয় জার্নাল 'যাদবপুর জার্নাল অফ কম্পেরেটিভ লিটারেচর'-এর একটি সংখ্যাও বেরোয়নি যাতে তাঁর লেখা নেই। এই জার্নালে ছাপা হয়েছিল রামায়ণ প্রসঙ্গে তাঁর দুটি দীর্ঘ রচনা। একত্রিত এবং পুনর্লিখিত হয়ে তা-ই পরে Rama and the Bards নামে বই আকারে বেরোয়। এ গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য হচ্ছে রামায়নের গড়ন। বইটির বাংলা অনুবাদ করেছেন সুবীর রায়চৌধুরী। জীবনের শেষ দশক এই রামায়ণ প্রসঙ্গ ফাদারের মন জুড়ে ছিল। এই বিষয়ে দ্বিতীয় গ্রন্থ, 'The Technique of Oral Composition in the Ramayana' লিখতে লিখতেই তিনি মারা যান। শেষ অধ্যায়টুকু শুধু বাকি ছিল। রামায়ণের ওপর এই গবেষনা সাহিত্যে ফাদারের শ্রেষ্ঠ অবদান। অমিয় দেব বলেছেন, 'রামায়ণ নিয়ে এধরনের মৌলিক আর কোনো আলোচনা আমার জানা নেই।'

অনুবাদ কর্মসহ তাঁর দশটি প্রকাশিত গ্রন্থ আছে। এছাড়া পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে অজস্র অগ্রন্থিত প্রবন্ধ। অনুবাদ এবং গবেষণামূলক প্রবন্ধ এই দুই বিভাগে সীমিত ছিল তাঁর সাহিত্যকর্ম। যাকে সৃজনধর্মী রচনা বলে সেরকম কিছু লেখেননি তিনি। তার কারণ এক তো তাঁর বহুমুখী কর্মধারা। অন্য কারণটি তাঁর উক্তির মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়। ন-টি ভাষা জানতেন তিনি। 'কিন্তু আমার কোনো মাতৃভাষা নেই, কোনো ভাষাতেই তেমন জোর পাই না' এই ছিল তাঁর আক্ষেপ। যদিও ফরাসি তাঁর মাতৃভাষা কিন্তু চর্চার অভাবে এর আধুনিক ভাষারীতির সঙ্গে যোগ হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। মাতৃভাষার বাইরে অন্য ভাষা চিন্তার এবং কল্পনার যোগ্য বাহন হতে পারে না, একথা তিনি মানতেন।

দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য ফাদার সম্পর্কে বলেছেন, 'সারস্বত সাধনা ছাপিয়েও যে তাঁর একটি বৃহৎ সত্তা বিরাজিত ছিল তার একটি মর্মস্পর্শী প্রমাণ পেলুম প্রয়ানের পরদিন দুপুরে।' এরপর তিনি বর্ণনা করেছেন সেই দৃশ্য। ফাদার চিরনিদ্রায় শায়িত মেঝেতে বসে একদল নারী-পুরুষ, নারীই বেশি, যারা সমাজের তথাকথিত নীচুতলার মানুষ। চার্চের এস্ট্যাবলিশমেন্টের বাইরে, বুদ্ধিজীবী বৃত্তের বাইরে ফাদারের যে নীরব মানবদরদী সমাজসেবী ভূমিকা ছিল, তিনি যে ছিলেন প্রকৃত দীনবন্ধু, এই শোকার্ত সহায়হারা ব্রাত্য ম্যনুষেরাই দেবে তার পরিচয়, যারা স্মৃতিকথা লিখতে পারে না কিন্তু যাদের মনে ফাদারের স্মৃতি আজও উজ্জ্বল। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ফাদারকে ভুলে গেলেও এরা ফাদারকে ভোলেনি। ফাদারের স্নেহপ্রাপ্ত দুঃস্থ সবলহীন এক

সংগীত শেখানোয়ও ছিল তাঁর সমান আগ্রহ। বহু ছাত্রকে গান শিখিয়েছেন তিনি। কয়েক বছর শরৎ বসু একাডেমির সংগীত শাখার সম্পাদকও ছিলেন।

বন্ধু এবং সহযোগী ফাদার ফালোঁ ফাদার আঁতোয়ান সম্পর্কে বলেছেন, 'তাঁর নিত্য-জিজ্ঞাসু মনের কৌতূহল ও জ্ঞানতৃষ্ণা তাঁকে কোনো বিদ্যাবিশেষের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে দিত না। আজীবন তিনি সমান আগ্রহে নব নব বিদ্যা ও জ্ঞানের অনুসন্ধানী ছিলেন। তা সত্ত্বেও পল্লবগ্রাহী ছিলেন না কোনো মতে। মেধাবী ছিলেন, তা ছাড়া অক্লান্ত পরিশ্রমী, কোনো বিষয়েই ভাসা ভাসা জ্ঞানে সন্তুষ্ট হতেন না। অধ্যাপক হওয়ার পরেও অধ্যাপনার চেয়ে অধ্যয়নই অনেক বেশি শ্রম ও সময় খরচ করে যেতেন।' তিনি পুরো সময়ের জন্য যোগ দেবার পরে বিভাগীয় জার্নাল 'যাদবপুর জার্নাল অফ কম্পেরেটিভ লিটারেচর'-এর একটি সংখ্যাও বেরোয়নি যাতে তাঁর লেখা নেই। এই জার্নালে ছাপা হয়েছিল রামায়ণ প্রসঙ্গে তাঁর দুটি দীর্ঘ রচনা। একত্রিত এবং পুনর্লিখিত হয়ে তা-ই পরে Rama and the Bards নামে বই আকারে বেরোয়। এ গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য হচ্ছে রামায়নের গড়ন। বইটির বাংলা অনুবাদ করেছেন সুবীর রায়চৌধুরী। জীবনের শেষ দশক এই রামায়ণ প্রসঙ্গ ফাদারের মন জুড়ে ছিল। এই বিষয়ে দ্বিতীয় গ্রন্থ, 'The Technique of Oral Composition in the Ramayana' লিখতে লিখতেই তিনি মারা যান। শেষ অধ্যায়টুকু শুধু বাকি ছিল। রামায়ণের ওপর এই গবেষনা সাহিত্যে ফাদারের শ্রেষ্ঠ অবদান। অমিয় দেব বলেছেন, 'রামায়ণ নিয়ে এধরনের মৌলিক আর কোনো আলোচনা আমার জানা নেই।'

অনুবাদ-কর্মসহ তাঁর দশটি প্রকাশিত গ্রন্থ আছে। এছাড়া পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে অজস্র অগ্রন্থিত প্রবন্ধ। অনুবাদ এবং গবেষণামূলক প্রবন্ধ এই দুই বিভাগে সীমিত ছিল তাঁর সাহিত্যকর্ম। যাকে সৃজনধর্মী রচনা বলে সেরকম কিছু লেখেননি তিনি। তার কারণ এক তো তাঁর বহুমুখী কর্মধারা। অন্য কারণটি তাঁর উক্তির মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়। ন-টি ভাষা জানতেন তিনি। 'কিন্তু আমার কোনো মাতৃভাষা নেই, কোনো ভাষাতেই তেমন জোর পাই না' এই ছিল তাঁর আক্ষেপ। যদিও ফরাসি তাঁর মাতৃভাষা কিন্তু চর্চার অভাবে এর আধুনিক ভাষারীতির সঙ্গে যোগ হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। মাতৃভাষার বাইরে অন্য ভাষা চিন্তার এবং কল্পনার যোগ্য বাহন হতে পারে না, একথা তিনি মানতেন।

দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য ফাদার সম্পর্কে বলেছেন, 'সারস্বত সাধনা ছাপিয়েও যে তাঁর একটি বৃহৎ সত্তা বিরাজিত ছিল তার একটি মর্মস্পর্শী প্রমাণ পেলুম প্রয়ানের পরদিন দুপুরে।' এরপর তিনি বর্ণনা করেছেন সেই দৃশ্য। ফাদার চিরনিদ্রায় শায়িত মেঝেতে বসে একদল নারী-পুরুষ, নারীই বেশি, যারা সমাজের তথাকথিত নীচুতলার মানুষ। চার্চের এস্ট্যাবলিশমেন্টের বাইরে, বুদ্ধিজীবী বৃত্তের বাইরে ফাদারের যে নীরব মানবদরদী সমাজসেবী ভূমিকা ছিল, তিনি যে ছিলেন প্রকৃত দীনবন্ধু, এই শোকার্ত সহায়হারা ব্রাত্য ম্যনুষেরাই দেবে তার পরিচয়, যারা স্মৃতিকথা লিখতে পারে না কিন্তু যাদের মনে ফাদারের স্মৃতি আজও উজ্জ্বল। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ফাদারকে ভুলে গেলেও এরা ফাদারকে ভোলেনি। ফাদারের স্নেহপ্রাপ্ত দুঃস্থ সবলহীন এক

কবির মধ্যে ফাদারের স্মৃতিরক্ষার জন্য দেখেছি যে আকুলতা, যেভাবে নীরবে তার চোখের জল ঝরতে দেখেছি তাতেই বুঝেছি যে সব কিছু ছাপিয়ে ফাদারের প্রেমময় সত্তাই তাঁর প্রকৃত স্বরূপ।

শান্তিভবনে যিনি এখন ফাদারের স্থলাভিষিক্ত ফাদারের স্বদেশীয় আরেক যাজক ফাদার শিলিংস, ফাদার আঁতোয়ান এবং ফাদার ফালোঁর ধারা বজায় রেখেছেন। আঁতোয়ানকে সশরীরে না দেখলেও ফাদার শিলিংসকে কাছ থেকে দেখেছি। পাজামা-পাঞ্জাবি পরা সদাহাস্যময় সুদর্শন তেজোময় ফাদার শিলিংস বাংলা বলেন অনর্গল। ভাবাই যায় না, এক ফরাসিভাষী বেলজিয়ান কলকাতায় বসে পরম উৎসাহে বাংলা লিটল ম্যাগাজিন চালাচ্ছেন। ফাদার আঁতোয়ানের মতো ফাদার শিলিংসও শিক্ষকতা করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরাসি বিভাগে আছেন তিনি। শান্তিভবনে ফাদার আঁতোয়ান যে 'এক্সপেরিমেন্ট' শুরু করেছিলেন তারই সফল প্রতিমূর্তি ফাদার শিলিংস। আঁতোয়ান সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য পেয়েছি তাঁর কাছে যার ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন রচিত। প্রথা-সংস্কার ভুলে মূল সত্তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে দূরকে নিকট করে সমাজ ও পরিবেশের জন্য নিঃস্বার্থ ভালবাসা, জ্ঞানচর্চায় সমাহিত ঋষির ন্যায় সরল বিবেকী জীবনযাপন, এসবের উজ্জ্বল ও শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত ফাদার আঁতোয়ানের জীবন।